একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

'On the banks of Tungabhadra': Sharadindu's historical consciousness and the Impression of contemporary experience

'তুঙ্গভদ্রার তীরে': শরদিন্দুর ইতিহাস চেতনা ও সমকালের অভিজ্ঞতার ফসল

Name of the Author: Sayantan Nandi

Affiliation: I graduated from the Department of Bengali Language and Literature of Ramakrishna Mission Vidyamandir with the highest marks in 2023 and completed my postgraduate studies in 2025 with second place and first place in the Rabindra Sahitya special paper. I am preparing for research by passing the UGC NET exam in December 2025.

Abstract: Among the novels based on historical themes written by Sharadindu Bandyopadhyay, 'Tungabhadrar Tire' is one of the most significant. In this essay, I have discussed the work in two parts. The first part examines how the novelist has portrayed the character of Devaraya, drawn from the pages of history. The second part analyzes how Sharadindu's sense of history and his contemporary experiences have shaped the subject matter of the narrative.

Keywords: Devaraya, Tungabhadra, Vijaynagar, Partition, Horseshoe, Religious War, Sati System, Virupaksha Temple, Stilts, Bahmani Kingdom.

‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’: শরদিন্দুর ইতিহাস চেতনা ও সমকালের অভিজ্ঞতার ফসল

সায়ন্তন নন্দী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম ও শেষ ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস ‘তুঙ্গভদ্রার তীরে’। ১৩৭২ বঙ্গাব্দে ‘শারদীয় আনন্দবাজার’ পত্রিকায় উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। আলোচনায় প্রবেশের আগে আমরা যদি উপন্যাসের ভূমিকা অংশ দেখি তাহলে ধারণা করে নিতে অসুবিধা হয় না যে, কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ‘বিজয়নগর’ যা ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়। এখানে ইতিহাস ও শরদিন্দুর কল্পময় চেতনা যেন মিলেমিশে একাকার। তবে কখনোই সেই কল্পময় চেতনা মূল ইতিহাসকে বিকৃত করেনি। লেখকের দুটি বক্তব্য এই প্রসঙ্গে তুলে ধরছি –
ক। “এই কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা Robert Sewell-এর A Forgotten Empire এবং কয়েকটি সমসাময়িক পান্থলিপি হইতে সংগৃহীত। Sewell- এর গ্রন্থখানি ৬৫ বছরের পুরাতন। তাই ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদিত গ্রন্থ The Delhi Sultanate পাঠ করিয়া Sewell -তথ্যগুলি শোধন করিয়া লইয়াছি। আমার কাহিনীতে ঐতিহাসিক চরিত্র থাকিলেও কাহিনী মৌলিক...”[১]
খ। “আমার কাহিনী Fictionised history নয়, Historical fiction”[২]
অর্থাৎ কাহিনিকে শক্ত করে বেঁধে রয়েছে ইতিহাস। কিন্তু শুধুই কি ইতিহাস? লেখকের সমকাল চেতনা কি আমরা কোথাও পাই না! সে আলোচনাও রয়েছে প্রবন্ধের পরতে পরতে। তবে এই উপন্যাসটি সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটি চিঠির কিয়দংশ তুলে ধরছি। লেখককে তিনি জানিয়েছেন –“তুঙ্গভদ্রার তীরে কয়েকদিন আগে পাইয়াছি।...আপনি বিজয়নগরের অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতি একটি মনোরম কাহিনীর মধ্য দিয়া ফুটাইয়া ওঠাইয়াছেন- এজন্য আমরা অর্থাৎ ঐতিহাসিকেরা খুবই কৃতজ্ঞ কারণ লোকে ইতিহাস পড়ে না -কিন্তু আপনার বই পড়িবে। Alexander Dumas যে উদ্দেশ্য নিয়া Three Muskateers প্রভৃতি লিখিয়াছেন আপনার দুইখানি উপন্যাসের মধ্য দিয়া তেমনি শশাঙ্কের পরবর্তী সময়কার বাংলা ও দেবরায়ের বিজয়নগর সম্বন্ধে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে ‘Delhi Sultanate’ P. 460-তে আমার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইলতুৎমিসের সময়ে না হউক দেবরায়ের সময়ে ইহার প্রচলন ছিল। আপনি নিশ্চয়ই ফেরিস্তা বিজয়নগরের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়াছেন। ইহা যখন পড়ি তখন মনে হইয়াছিল ইহার কয়েকটি কাহিনী ঔপন্যাসিকের খোরাক যোগাইতে পারে।”[৩]

তুঙ্গভদ্রার তীরে প্রবেশের আগে শরদিন্দু ‘ঊর্মিমর্মর’ অংশ উল্লেখ করে পাঠকের মনে যেন ইতিহাস আর গল্পের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিতে চেয়েছেন। তুঙ্গভদ্রার ভৌগোলিক বর্ণনা থেকে শুরু করে দক্ষিণতীরে বিরুপাক্ষের পাষাণমূর্তি ঘিরে দুর্গ নগর বিজয়নগরের ইতিহাস-ঐতিহ্য- ঐশ্বর্যের কথা বলেছেন। “কোনো এক স্তব্ধ সন্ধ্যায়, আকাশে সূর্য যখন অস্ত গিয়াছে কিন্তু নক্ষত্র পরিস্ফুট হয় নাই, সেই সন্ধিক্ষণে কৃষ্ণা ও ভুঙ্গভদ্রার সঙ্গমস্থলে ত্রিকোণ ভূমির উপর দাঁড়াও। কান পাতিয়া শোনো, শুনিতে পাইবে তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণার কানে কানে কথা বলিতেছে; নিজের অতীত সৌভাগ্যের দিনের গল্প বলিতেছে। কত নাম-হরিহর বুক্ক কুমার

কম্পন দেবরায় মল্লিকার্জুন-তোমার কানে আসিবে। কত কুটিল রহস্য, কত বীরত্বের কাহিনী, কত কৃতঘ্নতা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রেম বিদ্বেষ, কৌতুক কুতূহল, জন্মমৃত্যুর বৃত্তান্ত শুনিতে পাইবে।"[৪]

'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসের প্রধানত দুটি ক্ষেত্রে শরদিন্দুর ইতিহাস চেতনা ও সমকালের অভিজ্ঞতার প্রকাশ দেখতে পাই। চরিত্রবুননে ও কাহিনিবয়নে। প্রথমে চরিত্র বুননের কথায় আসা যাক। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসের একমাত্র ঐতিহাসিক চরিত্র দ্বিতীয় দেবরায় । এই দ্বিতীয় দেবরায়ের অনুপুঙ্খ বিবরণ ইতিহাসে নেই। শরদিন্দু এই রাজার কাহিনি নির্মাণ করেছেন ইতিহাসের আধারেই। দেবরায়ের উড়িষ্যাবিজয়ের কাহিনি ইতিহাসে নেই। কিন্তু দেবরায় উড়িষ্যা আক্রমণ করেছিলেন, পরাজিত উড়িষ্যারাজ ভানুদেব 'দেবরায়ের হস্তে নিজ কন্যাকে সমর্পণ করিবার প্রস্তাবে ' সম্মত হয়েছিলেন। আরও একটি শর্ত ছিল 'কন্যাকে বিজয়নগর পাঠাইতে হইবে, সেখানে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।'এই শর্তের সূত্র ধরে শরদিন্দু বিজয়নগর রাজ্যের-রাজ্যশাসন প্রণালীর সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছেন 'তৎকালে নিজ রাজ্য ছাড়িয়া বহু দূরে যাওয়া নিরাপদ ছিল না। চারিদিকে শত্রু ওত পাড়িয়া আছে, সিংহাসন শূন্য দেখিলেই ঝাঁপাইয়া পড়িবে। ' ঘরের শত্রু তো আছেই। বিজয়নগর রাজ্যের উত্তরে বহমনি রাজ্য। বহমনি রাজ্যের সুলতান মাঝে মাঝেই বিজয়নগরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিজয়নগর রাজ্যকে তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হত। তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণার সঙ্গমস্থলে রায়চুর দোয়াব ছিল অত্যন্ত উর্বর। বিশেষ করে খনিজ সম্পদের জন্য প্রত্যেক সম্রাটেরই এর উপর নজর ছিল। বিজয়নগর রাজ্যকে সদাসর্বদা এর জন্য তীক্ষ্ম নজরদারি করতে হত। তা ছাড়া হায়সালা রাজের পতনের পরও বিজয়নগরকে দাক্ষিণাত্যের ছোট ছোট রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হত। ঘরের শত্রু বলতে দ্বিতীয় দেবরায়ের ভ্রাতারা। ইতিহাসে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু না থাকলেও দ্বিতীয় দেবরায় যে অকর্মণ্য পিতা ও পিতৃবাক্য ডিঙিয়ে রাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন সে কথা ইতিহাসে আছে। সেই সূত্রে কনিষ্ট ভ্রাতা কম্পনদেবের অবতারণা সম্ভব হয়েছে উপন্যাসের গল্পকথনে। অন্য ভ্রাতা বিজয়রায় সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত থাকতেন। কে জানে শরদিন্দুর এই কল্পনা দ্বিতীয় দেবরায়ের কূটকৌশলের দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য কি না ! দেবরায়ের পিতা বিজয়রায় রাজকার্যে মনোযোগী ছিলেন না বটে, 'প্রৌঢ় বয়সে রাজপ্রাসাদে বসিয়া তিনি দুষ্ট শিশুর ন্যায় বিচিত্র খেলা খেলিতেছেন।' দেবরায় অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন উপন্যাসে পাই। তাঁর দাম্পত্য জীবন ছিমছাম। তিন পত্নী। এক পুত্র মল্লিকার্জুন। সকলকেই তিনি ভালবাসতেন । উপন্যাসের আর কোন চরিত্র ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে না। তাই এবার আমরা দেখবো কাহিনি বয়নের ক্ষেত্রে শরদিন্দুর ইতিহাস চেতনা ও সমকালের অভিজ্ঞতা কীভাবে কাজ করেছে । উপন্যাসের কাহিনির শুরু হয়েছে নৌযাত্রার কথা দিয়ে। অর্থাৎ শরদিন্দু ভারতবর্ষের নৌবিদ্যার গৌরবের সেই বিশেষ দিনগুলো স্মরণ করেছেন। কিন্তু কাহিনির প্রথমেই কেন? আসলে 'নৌকো' অর্থাৎ যোগাযোগ মাধ্যম, অর্থাৎ একদিক দিয়ে তিনি যেমন পাঠককে নিয়ে নৌকো করে সেই প্রাচীন বিজয়নগরে পাড়ি দিতে চেয়েছেন তেমনি অপরদিকে দুটো বিপরীত (দ্বিতীয় দেবরায় ও বিদ্যুন্মালা-মণিকঙ্কণা) কাহিনির মধ্যে একটা যোগাযোগ সূত্র তুলে ধরে এই সুযোগে ভারতের প্রাচ্য উপকূলে নৌবিদ্যার বিশেষ উৎকর্ষকে তুলে ধরেছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে জলপথই যে ছিল একমাত্র বাণিজ্যের উপায় সে কথা শরদিন্দু তুলে ধরেছেন তাঁর আখ্যানে। উত্তরে নৌ-সাধনোদ্যত বঙ্গদেশ থেকে দক্ষিণে তৈলঙ্গ তামিল দেশ

পর্যন্ত বন্দরে বন্দরে বৃহৎ বহিত্র প্রস্তুত হতো, এতে চড়েই ভারতের বণিকেরা ব্রহ্ম , শ্যাম, কম্বোজ ও সাগরিকার দ্বীপপুঞ্জে ঘুরে ঘুরে বাণিজ্য করতো , শুধু তাই নয় উপনিবেশ যেমন গড়তো, তেমনি রাজ্যস্থাপন করতো। এইভাবে বহু শতাব্দী চলার পর একসময় কালান্তক ঝড়ের মতো দিকপ্রান্তে আরব জলদস্যু দেখা দেয়, সংঘাত বাঁধে , ভারতের রত্নভরা তরী লবণজলে ডুবলেও দমন করতে পারেনি দস্যুরা। তাই তো উপন্যাসে দেখি, সুদূর কলিঙ্গ থেকে বিদ্যুন্মালা-মণিকঙ্কণা বিজয়নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। শরদিন্দু প্রাচীন ভারতবর্ষের বাণিজ্যের এই রূপ উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকেননি , একই সঙ্গে ভারতের নৌ -নির্মাণ শিল্পকেও গুরুত্ব দিয়েছেন । উপন্যাসে আমরা তিন ধরনের নৌকার কথা পাই । প্রথম নৌকা আয়তনে বিশাল, সমুদ্রগামী বহিত্র, দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হলেও রণতরীর আকারে গঠিত, সঙ্কীর্ণ ও দ্রুতগামী, এবং এই ধরনের নৌকায় ৫০জন যোদ্ধা স্বচ্ছন্দেই থাকতে পারে। তৃতীয় নৌকাটি ভারবাহী ভড়, তার গতি মন্থর।

উপন্যাসের প্রথম পর্বের দ্বিতীয় অংশে শরদিন্দু আরো একটি ইতিহাসকে তুলে ধরলেন। উপন্যাসে রয়েছে রাজকুমারী বিদ্যুন্মালা চলেছেন বিজয়নগরের তরুণ রাজা দ্বিতীয় দেবরায়কে বিবাহ করতে। এই দেবরায় যেহেতু বুদ্ধিমান ও একই সঙ্গে রণদক্ষ তাই সিংহাসনে আরোহণ করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ম্লেচ্ছ শক্তিকে প্রতিহত করতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। অথচ নিরন্তর বিবাদমান ও কলহপ্রিয় হিন্দু রাজারা ঐক্যস্থাপন করতে দেবরায় একটি নতুন পথ ধরলেন। এক একটি প্রদেশের রাজকন্যাকে বিবাহ করতে শুরু করেন। এতে কুটুম্বিতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। সাম্রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করতে রাজপুত বিবাহের মাধ্যমে এই একই পন্থা অবলম্বন করেছেন সম্রাট আকবরও । কিন্তু সব রাজা এই বশ্যতা স্বীকার করে নি। কিন্তু তাদের খড়্গহস্ত দেবরায়ের তলোয়ারের কাছে ভূলুণ্ঠিত। তাই কলিঙ্গের রাজা গজপতি চতুর্থ ভানুদেবকেও শান্তির ভিক্ষা করতে হয়েছিল, যার ফলশ্রুতি আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে একাধিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ দ্বিতীয় দেবরায়কে বিবাহ করার জন্য বিদ্যুন্মালার বিজয়নগরে গমনোদ্যোগ। ইতিহাসকে সরিয়ে রাখলে একজন নারীর পক্ষে কি এই দেবরায়কে গ্রহণ করা সম্ভব? যেখানে কর্তব্য রয়েছে সাম্রাজ্যের জন্য আর অন্তঃপুরের বাসিন্দা সেই নারীর জন্য ভালোবাসা সে কোথায়? নাকি সে শুধু সন্তান উৎপাদনেরই যন্ত্র?

শরদিন্দু দক্ষিণ ভারতের বিবাহের একটি রীতিকে তুলে ধরেছেন। আর্যরা দক্ষিণ ভারতে এসে বিবাহের একটি রীতি প্রবর্তন করে যে, আর্য পুরুষ বিবাহকালে আর্যা বধূর সঙ্গে সঙ্গে একটি অনার্যা বধূও গ্রহণ করতে পারতেন। যদিও এই রীতির প্রধান উদ্দেশ্য বংশবৃদ্ধি। উপন্যাসে রয়েছে বিদ্যুন্মালার মা রুক্মিণী দেবী ছিলেন আর্যা কিন্তু মণিকঙ্কণার মা চম্পাদেবী ছিলেন অনার্যা। অন্যদিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঘনতা দেবার জন্য শরদিন্দু দাক্ষিণাত্যের বিবাহের আরো একটি প্রণালীকে তুলে ধরলেন। দাক্ষিণাত্যে উপনিবিষ্ট আর্য জাতির মধ্যে বিশেষত দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে একটি বিশেষ সামাজিক নীতি প্রচলিত হয়েছিল। এই নীতি হল মাতুলের সঙ্গে ভাগিনেয়ীর বিবাহ। উত্তরাপথে যাঁরা এই বিবাহকে ঘৃণার চোখে দেখতেন তাঁরাও দাক্ষিণাত্যে গিয়ে দেশাচার ও লোকাচার বরণ করে নিতেন। শরদিন্দু শুধু ইতিহাসকে তুলে আনেননি, সেই সঙ্গে সেই ইতিহাসেরও প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাই আখ্যানের প্রয়োজনে তিনি আনলেন চিপিটকমূর্তি ওরফে

হরিআপ্পা কৃষ্ণমূর্তি চরিত্রটিকে। উপন্যাসে দেখি, চিপিটক যখন গজপতি চতুর্থ ভানুদেবের রাজপ্রাসাদে এসে বাস করতে শুরু করেছেন, তখন তার মনে দূর ভবিষ্যতের একটি আশা বীজরূপে বড়ো হতে শুরু করে।

"যথাকালে তাঁহার একটি ভাগিনেয়ীর আবির্ভাব ঘটিল, চিপিটকের আশা অঙ্কুরিত হইল। তারপর বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু মাতুলের সহিত রাজকন্যার বিবাহের প্রসঙ্গ কেহ উত্থাপন করিল না, চিপিটকের আশার অঙ্কুর জলসিঞ্চনের অভাবে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল; শ্যালকরূপে রাজসংসারে প্রবেশ করিয়া রাজ-জামাতা পদে উন্নীত হইবার উচ্চাশা তাঁহার ফলবতী হইল না। চিপিটকমূর্তি একবার ভগিনীর কাছে কথাটা উত্থাপন করিয়াছিলেন, শুনিয়া রাজমহিষী হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন- 'একথা অন্য কারুর কাছে বলো না। 'প্রকৃত কথা, কলিঙ্গের সমাজবিধি ঠিক আর্যাবর্তের মতও নয়, দাক্ষিণাত্যের মতও নয়, মধ্যপথগামী। ভারতের মধ্যপ্রদেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থা প্রায় একই প্রকার; তাহারা সুবিধামত একূল-ওকূল দুকূল রাখিয়া চলে। কলিঙ্গের লোকেরা মামা-ভাগিনেয়ীর বিবাহকে ঘৃণার চক্ষে দেখে না। আবার অতি উচ্চাঙ্গের সৎকার্য বলিয়াও মনে করে না। স্ত্রীলোকের কাছা দিয়া কাপড় পরার মত ইহা তাহাদের কাছে কৌতুকজনক ব্যাপার, তার বেশি নয়।"[৫]

শরদিন্দু ভারতবর্ষের মুসলিম আক্রমণ এবং বিজয়কে ভারতবাসীর জীবনে মহা দুর্বিপাক বলে মনে করতেন। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসে তিনি মুসলিম অত্যাচার , অবিচার, আক্রমণ, বিরোধের বিষয়টিকে কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছেন। অর্জুন বর্মা যখন বলে সে, গুলবর্গা থেকে পালিয়ে এসেছে, কারণ গুলবর্গা দক্ষিণে যবনদের রাজধানী, ওরা যেমন অত্যাচারী তেমনি বর্বর। শুধু অর্জুন বর্মা নয়, তার পরিবারও এই অত্যাচারের স্বীকার। অর্জুন এর মুখে শুনি তারা যাদববংশীয় ক্ষত্রিয় এবং তার পূর্বপুরুষেরা বহু শতাব্দী আগে উত্তর দেশ থেকে এসে কৃষ্ণা নদীর তীরে বসতি স্থাপন করে। কারণ উত্তর দেশে তখন যবনের আবির্ভাব হয়েছে, মানুষের প্রাণে সুখ শান্তি নেই। দাক্ষিণাত্যে এসেও তার পূর্বপুরুষেরা বেশি দিন সুখ শান্তি ভোগ করতে পারেনি , কারণ সেখানেও যবনেরা এসে উপস্থিত। ফলত উত্তরাপথের যে দুরবস্থা হয়েছিল দক্ষিণাপথেরও সেই দুরবস্থা হল। কিন্তু বিজয়নগরে হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হলে যবনেরা কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ দিক থেকে বিতাড়িত হয়। অর্জুনের পূর্বপুরুষেরা কৃষ্ণার উভয় তীরে বসতি স্থাপন করেছিলেন, ফলত তাঁরা যবনের অধীনেই থাকলো। মুসলমানেরা যেহেতু দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, তাদের প্রাণে ভয় নেই, তারা দস্যুরূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল, সেই দস্যুবৃত্তি এখনো ত্যাগ করতে পারেনি। তারা লুঠ করতে জানে কিন্তু রাজ্য চালাতে জানে না, আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে জানে না। তাই তারা কর্মদক্ষ বুদ্ধিমান হিন্দু দেখলেই জোর করে তাদের মুসলমান বানিয়ে নিজেদের দলে টানার চেষ্টা করে। রামবর্মাকেও তারা গরু খাইয়ে নিজের দলে টেনে নিতে চেয়েছিল সঙ্গে অর্জুনবর্মাকেও। মুসলিমদের এই অত্যাচার শুধু এরাই ভোগ করেনি, করেছে সঙ্গম বংশীয় দুই ভাই, হরিহর ও বুক্ক। যারা বিজয়নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এদের সম্পর্কে শরদিন্দু বলেছেন –"দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ তুঘলক দুই ভ্রাতার অসামান্য রাজনৈতিক প্রতিভা দেখিয়া তাঁহাদের জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছিলেন। সে-সময়ে গুণী ও কর্মকুশল হিন্দু পাইলেই মুসলমান রাজারা তাঁহাদের বলপূর্বক মুসলমান করিয়া নিজেদের কাজে লাগাইতেন। কিন্তু হরিহর ও বুরু বেশি দিন মুসলমান রহিলেন না। তাঁহারা পলাইয়া

আসিয়া শৃঙ্গেরি শঙ্করমঠের এক সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হইলেন। সন্ন্যাসীর নাম বিদ্যারণ্য, তিনি তাঁহাদের হিন্দুধর্মে পুনর্দীক্ষিত করিলেন। তারপর দুই ভাই মিলিয়া গুরুর সাহায্যে হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা করিলেন। বিজয়নগরের আদি নাম বিদ্যানগর, পরে উহা মুখে মুখে বিজয়নগরে পরিণত হয়।

কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে যখন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইতেছিল, ঠিক সেই সময় কৃষ্ণার উত্তর তীরে একজন শক্তিশালী মুসলমান দিল্লীর নাগপাশ ছিন্ন করিয়া এক স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই রাজ্যের নাম বহমনী রাজ্য উত্তরকালে বিজয়নগর ও বহমনী রাজ্যের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায় চিরস্থায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বহমনী রাজ্যের চেষ্টা কৃষ্ণার দক্ষিণে মুসলমান অধিকার প্রসারিত করিবে, বিজয়নগরের প্রতিজ্ঞা কৃষ্ণার দক্ষিণে মুসলমানকে ঢুকিতে দিবে না।

রাজ্য প্রতিষ্ঠার অনুমান শত বর্ষ পরে বিজয়নগরের যিনি রাজা হইলেন তাঁহার নাম দেবরায়। ইতিহাসে ইনি প্রথম দেবরায় নামে পরিচিত। দেবরায় অসাধারণ রাজ্যশাসক ও রূণপণ্ডিত ছিলেন। তিনি তুরস্ক হইতে ধানুকী সৈন্য আনাইয়া নিজ সৈন্যদল দৃঢ় করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পঞ্চাশবর্ষব্যাপী শাসনকালে সমস্ত দাক্ষিণাত্য বিজয়নগরের পদানত হইয়াছিল, মুসলমান রাজশক্তি কৃষ্ণার দক্ষিণে পদার্পণ করিতে পারে নাই।”[৬]

এ তো গেল দাক্ষিণাত্যের কথা, শরদিন্দু বাংলার কথা কি কিছু বলবেন না? হ্যাঁ বলেছেন। সেকারণেই বললাম চরিত্রের আগমন। বলরামের মুখে শুনি যে, বাংলা এখন আর সেই শষ্য শ্যামলা বাংলা নেই, সেখানে আর নিশ্চিন্তে বসে ছোট শিশু মায়ের আঁচলে থাকে না, কারণ বাংলা এখন শশ্মান, যে শশ্মানে আর আদি পুরুষ ও আদি প্রকৃতি থাকে না, থাকে রক্তমাংসের শরীরের নরপিশাচ। যাঁদের হৃদয়ে ‘রক্তকরবী’র কিশোরের মতো কচি রক্তাক্ত হৃদপিন্ড নেই, যে বাংলায় আর রবীন্দ্রনাথের বিশু পাগল পথে পথে গান গেয়ে বেড়ায় না। শুধু তাই নয় এই যবনের রাজধানীতে বিয়ে করলে তার প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষত সুন্দরী বৌ থাকলে। শরদিন্দু অর্জুনের জবানবন্দীতে তৎকালীন বাংলার সেই অরাজকতার চিত্র তুলে ধরে বলেছেন, যাদের ঘরে সুন্দরী মেয়ে জন্মেছে তারা মেয়ের বয়স সাত আট হতে না হতেই বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয় , অনেকেই মেয়ের মুখে ছুরি দিয়ে দাগ কেটে মেয়েকে কুৎসিত করে দেয়, যাতে যবনদের নজর না পড়ে। কিন্তু তাতে কি শেষরক্ষা হয়? মুসলমান সিপাহীরা যুবতী মেয়ে দেখলেই ধরে নিয়ে যায়, আর স্বামীকে কেটে রেখে যায়, যাতে নালিশ করবার কেউ না থাকে। উপন্যাসের এই ঘটনা আমাদের নীল বিদ্রোহের কথা মনে করিয়ে দেয় আবার ব্রিটিশ রাজশক্তির নৃশংসতাও মনে করিয়ে দেয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যখন বাংলা তথা বিভিন্ন প্রদেশের তরুণ-তরুণীরা অস্ত্র সংগ্রহ করছে এবং অস্ত্র তৈরি করছে তখন ইংরেজরা বিভিন্ন ভাবে তাদের উপর অত্যাচার শুরু করে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার ও টিকিয়ে রাখার জন্য। উপন্যাসে দেখি, যে কামারশালায় বসে গোপনে বলরাম কাস্তে, কুড়ুল, কাটারি, গরুর গাড়ির চাকার হাল , তলোয়ার, সড়কি, এমনকি কামান পর্যন্ত তৈরি করতো সেই কামারশালা মুসলমান সেপাইরা তছনছ করে দিয়ে গেছে, শুধু তাই নয়, তার সুন্দর বৌকেও ধরে নিয়ে গেছে নিজেদের লালসা চরিতার্থ করতে।

শরদিন্দু এই আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে পাঠকের কাছে শুধুই কি প্রাচীন ইতিহাসের কথাই বলে চুপ করে থাকবেন? আর যে সময়ে বসে তিনি উপন্যাস লিখেছেন তার কথা কি কোথাও বলবেন না! আসলে শরদিন্দু কালজয়ী লেখক, সমকাল তাঁর কাছে গুরুত্ব পাবেই। অর্জুন বর্মার পিতাকে জোর করে মুসলমান করার চেষ্টা করা ও ধর্মরক্ষার্থে অর্জুনের হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরে পালিয়ে আসা , বলরামও মুসলমান সৈন্যদের আক্রমন থেকে বাঁচতে কলিঙ্গে আশ্রয় নেয়, এ যেন পূর্ববঙ্গ থেকে সহায় সম্বলহীন মানুষদের এদেশে চলে আসার ঘটনার প্রতিফলন। পাশের বহমনী রাজ্যের সুলতান আহম্মদ শাহ দীর্ঘদিন ধরে নীরব রয়েছে, তার অভিসন্ধি কী? তাই নিয়ে রাজা দেবরায় আতঙ্কগ্রস্ত। তাঁর মনে হয়েছে মুসলিমদের সঙ্গে 'ধর্মযুদ্ধ' চলে না কারণ ধূর্ততা ও কপটতাই তাদের অস্ত্র। ধর্মযুদ্ধ করতে গিয়েই ভারতবর্ষ উৎচ্ছন্নে গেল। মহাসচিব সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত জানালে, দেবরায় বলেছেন, প্রস্তুত থাকা অবস্থাতেও নিশ্চিন্ততা আসে না, দু-একদিনের মধ্যেই সেনা পরিদর্শনে যেতে হবে। উপন্যাসের এইসব ঘটনা ও উক্তি ভারত -পাকিস্তান বিবাদ, কাশ্মীর সমস্যার কথাই মনে করিয়ে দেয়। ভারতকে বিভাজিত করে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম শরদিন্দুর নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ সাহিত্যমনে যে গভীর ভাবে দাগ কেটেছিল তার প্রমাণ তাঁর ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসগুলি। 'তুমি সন্ধ্যার মেঘ'-এ ভারতে মুসলিম অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গ এনেছেন , 'কালের মন্দিরা 'য় আক্রমণকারী হুণদের মধ্যে মুসলমানের ছায়া দেখেছেন। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'তে এই ভাবনারই প্রতিফলন তুঙ্গে পৌঁছেছে। শরদিন্দুর সমকালে ষাটের দশকে পাকিস্তান ও চিনের আক্রমণে ভারতের বৈদেশিক নীতির কঠিন পরীক্ষার সময়ে রাজা দেবরায়ের ভাবনাচিন্তাগুলো উপযুক্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোতে স্বাধীনতা হরণ করার নানা চক্রান্তের যে ছবি দেখতে পাই , ষাটের দশকে ভারতের রাজনীতিতে এই আশঙ্কার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। আর 'তুঙ্গভদ্রার তীরে ' উপন্যাসে রাজা দেবরায়ের বিজয়নগরে সেই আশঙ্কা উদ্বেগের চিত্রই অঙ্কন করলেন শরদিন্দু। উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থেকে দেশকে রক্ষা করতে , অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ঐক্য আনতেই বলপ্রয়োগে বিবাহের কৌশল অবলম্বন করেছিলেন দেবরায়। সমকাল চেতনা ও ঐতিহ্যময় প্রাচীন ইতিহাসকে এইভাবেই মিলিয়ে মিশিয়ে সৃষ্টি করেছেন 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটি।

ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসে শরদিন্দু বেশ কিছু রাজধানী নগরীর বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। কপোতকুট, কণসুবর্ণ, ত্রিপুরী, মগধ, উজ্জয়িনী নগরী তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশেষ ভাবে পাঠকের নজর কাড়ে। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসে বিজয়নগর তার ঐতিহ্যময় রাজপ্রাসাদ, বাজারহাট, পম্পাপতির মন্দির, পম্পা সরোবর, মালভূমি, পর্বতগুহা, তুঙ্গভদ্রা নদীর ঘাট, সর্বোপরি হেমকূট পর্বতের প্রজ্জ্বলিত শিখা নিয়ে প্রাচীন ইতিহাসকে মূর্ত করে তুলেছে। প্রতিটি স্থানকে পটভূমি করে যে মানবজীবন কাহিনি রচনা করেছেন লেখক, তাতে বিজয়নগর তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের নরনারীকে এদের থেকে পৃথক করা যায় না, এতটাই একাত্মতা সেখানে। দক্ষিণ ভারতের হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের বিজয় গৌরব দেশের অভ্যন্তরে তো বটেই, বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তৎকালীন পোর্তুগীজ পর্যটক পা-এজের মূল্যবান বিবরণ এই তথ্যাটিকে সমর্থন করে। এই উপন্যাসটিতেও তীব্র স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, স্বধর্মানুরাগ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। বিজয়নগরের শৌর্যবীর্যের কথা যা বহুলাংশে ছিল ইতিহাসের ছাত্রের অধীত বিষয়, তাকে বিশাল সাহিত্য

পাঠককুলের সামনে নতুন আলোকে উন্মোচিত করার পূর্ণ কৃতিত্ব শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের । শরদিন্দু ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন আর একদিক থেকে। এই রাজার অন্তঃপুর এবং বহির্ভবনে নারীপ্রাধান্যের ব্যাপারটি প্রথমে খাপছাড়া বলে মনে হয়। বাঙালি ঐতিহাসিক উপন্যাসের পাঠক মোগল অন্তঃপুরের অথবা পাঠান অন্তঃপুরের প্রহরী রূপে যোদ্ধাদের কথাই জানে। কিন্তু বিজয়নগরের সর্বত্রই যেন নারীনিয়ন্ত্রণে। রাজার প্রধান বিশ্বাসভাজন পিঙ্গলা রাজার পরিচারিকা, দেহরক্ষী, মন্ত্রণাদাতা। রাজপুরীকে পাহারা দিচ্ছে নারীবৃন্দ। গুপ্তপথ নারীদের জানা। উপন্যাসে শরদিন্দু যেন এক নারী আমলাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। ভাবতে অবাক লাগে সেকালের এই বর্ণনা ঠিকঠাক কি না! কিন্তু শরদিন্দু ইতিহাস থেকেই পেয়েছিলেন এই বিষয়টি। আমরা ইতিহাসের সাক্ষ্য উদ্ধার করি 'Women in general occupied a high position in society and instances of the active part they took in the political, social and literary life on the country are not rare. Besides, being trained in wrestling, handling swords and shields, music and other fine arts, some of them at any rate received a fair amount of literary education. Nuniz writes, 'lle (the king of Vijaynagar) has also women who wrestle, and others who are astrolodgers and soothsayers, and he has women who write all the accounts of expenses that are incurred inside the gales, and others whose duty it is to write all the affairs of the kingdom and compare their books and those of the writers outside, he has women also for music, who play instruments and sing. Evén the wives of the king are well versed in music...It is said that he has judges, as well as bailin's and watchmen who every night guard the palace, and these are women. (An advanced History of India, R. C. Majumdar, Hem Chandra Raychowdhury, Kalikinkar Datta, 1953) আগেই বলেছি মোগল অন্তঃপুরের সদৃশ বিজয়নগরের অন্তঃপুর নয়। সেই অন্তঃপুরে জেবউন্নিসা, উদিপুরী, যোজা এবং রাজপুরীর ষড়যন্ত্রের নানা অলিগলির সাক্ষাৎ পাই। সেখানে দরিয়া মোবারক ঢুকে পড়ে। অথবা চঞ্চলকুমারীর সহচরীদের সঙ্গে হাস্যপরিহাস এবং ঘটনা ঘটে বটে কিন্তু তা যেন রোমান্টিক বর্ণনার বাতাবরণ, শরদিন্দুর কল্পনায় প্রেমের অভিসার নেই এমন নয়, কিন্তু তার চাইতে প্রাধান্য নারীর – যেখানে পুরুষের মতোই স্বাভাবিক কর্মদক্ষতা নারীর। শরদিন্দু নারী মিছিলকে বর্ণান করে তুলেছেন। বিদ্যুন্মালা আর মণিকঙ্কণাকে নিয়ে পাল্কি অন্তঃপুরে ঢুকছে "রাজপুরীর সাত শত প্রতিহারিণী ও পরিচারিকা সভাগৃহের সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের বাম হস্তে চর্ম, দক্ষিণ হতে মুক্ত তরবারি। সকলেই দৃঢ়াঙ্গী যুবতী, সুদর্শনা। তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক তাতারী যুবতী আছে, পিঙ্গল কেশ ও নীল চক্ষু দেখিয়া চেনা যায়। রাজপুরীতে, সভাগৃহ ব্যতীত অন্যত্র, পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, এই নারীবাহিনী পুরী রক্ষণ করে ও পৌরজনের সেবা করে।"[৭]

ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসকে বাস্তবায়িত করতে সেই যুগটিকে প্রতিফলিত করার অভিপ্রায়ে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপর নজর দিয়েছেন লেখক। সমস্ত উপন্যাসে তার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। 'তুঙ্গভদ্রার

তীরে' উপন্যাসে দ্বিতীয় দেবরায়ের সময়কার কিছু রীতিনীতি উৎসবের প্রসঙ্গ এনেছেন। রাজা ও রাজপরিবারের পাত্রপাত্রীদের পম্পাপতির মন্দিরে বিবাহ হয়ে থাকে, এটিই চিরাচরিত রীতি। রাজার বিবাহের তিথি সর্বসমক্ষে প্রচারিত হবার পর রাজ্যময় উৎসবের ধুম পড়ে গেল। "সদ্য বিপন্মুক্তির পর রাজার বিবাহ, তাই উৎসব একটু বেশি জাঁকিয়া উঠিল। গৃহে গৃহে পুষ্পমালা দুলিল, নানা বর্ণের কেতন উড়িল। নাগরিকেরা দলবদ্ধভাবে গীত গাহিতে গাহিতে নগর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। চতুষ্পথে চতুষ্পথে বাজীকরের খেলা, মাঠে মাঠে মল্লযোদ্ধাদের বাহ্বাস্ফোট, হাতির লড়াই, তুঙ্গভদ্রার বুকে বিচিত্র নৌকাপুঞ্জের সম্মিলিত জলকেলি। বিজয়নগরের প্রজাগণ রাজাকে ভালবাসে, স্বতঃপ্রবৃত হইয়া উৎসবে গা ঢালিয়া দিয়াছে। "[৮] রাজপুরোহিত রাজকন্যাকে পরপুরুষ স্পর্শের দোষমুক্তির জন্য প্রত্যহ স্বহস্তে পম্পাপতির মন্দিরে অবগাহন স্নানের পর পুজো দেবার বিধান দিয়েছেন। এছাড়া কাহিনিতে দক্ষিণ ভারতীয় দেবদেবী-দেবমন্দির-পূজার্চনারীতি ও দেবদাসী প্রথার কথা আছে-আর বর্ণনাও মনোগ্রাহী- "নগরে অগণিত তুঙ্গশীর্ষ দেবমন্দির, কোনো মন্দির বীরভদ্রের, কোনো মন্দির রামস্বামীর, কোনো মন্দির মল্লিকার্জুনের। মন্দির সংলগ্ন ভবনে বহুসংখ্যক দেবদাসীর বাস।.... আরতি আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে দেবদাসীগণের সুঠাম দেহ নৃত্যের তালে ছন্দিত হইয়া উঠিল। মৃদঙ্গ মঞ্জীরার ধ্বনির সহিত নূপুর ও কঙ্কণকিঙ্কিণীর নিক্কণ মিশিল। দশটি দেহ একসঙ্গে লীলায়িত হইতেছে, দশজোড়া নূপুর একসঙ্গে ঝংকৃত হইতেছে, বিলোল বাহু-মৃণাল একসঙ্গে বিসর্পিত হইতেছে। নর্তকীদের মুখের ভাব তদগত, চক্ষু অর্ধ নিমীলিত, তাহাদের অন্তর্শ্চেতনা যেন ঊর্ধ্বলোকে সাক্ষাৎ নটরাজের সন্নিধানে উপনীত হইয়াছে।"[৯] শব্দ ব্যবহারের মুন্সীয়ানায় পাঠক সেই যুগপরিবেশে অনায়াসে পৌঁছে যায়। সে যুগে রাজারা সহজে কোনো মানুষকে বিশ্বাস করে নিজের দেশের বিপদ ডেকে আনত না-তাই গুপ্তচর নিয়োগ একটি চিরাচরিত রীতি। অর্জুনকে রাজা ও মন্ত্রী মুখের কথায় বিশ্বাস করেছে জানালেও তাদের অন্তর সন্দেহমুক্ত হয়নি। আমরা দেখি রাজপথে ঘুরে বেড়াবার সময় প্রতি মুহূর্তে অর্জুনবর্মা একই লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বলরাম ও অর্জুন তাকে ধরে গুপ্তচর বলে চিহ্নিত করেছে। আবার অর্জুনবর্মাকে রাজা গুপ্তচর বৃত্তির কাজে পাঠিয়েছে। কাহিনির বিভিন্ন পরিচ্ছেদে লেখক প্রাচীনকালের খাদ্যবস্তুর নিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন, ব্যবহার করেছেন তৎসম শব্দ যাতে প্রাচীনত্বের গন্ধ পাওয়া যায়। অর্জুন ও বলরামের জন্য মঞ্জিরা খাবার সাজিয়ে এনেছে গুপ্ত গুহায়। "রাজবাটি হইতে রোজ নূতন নূতন অন্ন -ব্যঞ্জন আসে। আজ আসিয়াছে শর্করা-মধুর পিণ্ডক্ষীর, দুই প্রকার মৎস্য, শূল্য মাংস, উখ্য মাংস, দুগ্ধফেননিভ তণ্ডুল, ঘৃতলিপ্ত রোটিকা, সম্বর, অবদংশ ও পর্পট। দক্ষিণ দেশে আহারের নিয়ম মধুরেণ সমাপয়েৎ নয়, মধুর খাদ্য দিয়া আহার আরম্ভ। অর্জুন ও বলরাম পিণ্ডক্ষীর মুখে দিয়া পরম তৃপ্তিভরে ভোজন আরম্ভ করিল। "[১০] এছাড়াও অনেক কৌতুক অনেক হাস্য জমা আছে উপন্যাসের আনাচে কানাচে। যে সব চরিত্রকে ঘিরে এই হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে তারাও প্রাচীনত্বের ঐতিহ্য বহন করেই এসেছে। মন্ত্রী লক্ষণ মল্লপ অন্যান্য মন্ত্রীদের মতো কুশলী প্রজ্ঞাবান, কিন্তু এখানে তার মাথা ঘামানোর সঙ্গে সঙ্গে একটানা সুপুরি কাটার মধ্যে কৌতুক লুকিয়ে আছে। চিপিটক মন্দোদরীর উক্তি বিনিময়, বিবাহ না করেও একই গুহায় বাস, কারণ দ্বীপের মানুষের কাছে তারা স্বামী-স্ত্রী অথবা বৃদ্ধ রাজ কবিরাজ রসরাজের মাতাল অবস্থার চিত্রের মধ্যেও অনেক মজার খোরাক আছে। তবে যুগটিকে প্রকাশ করতে বা

কাহিনিকে বিশ্বাসযোগ্য ও বাস্তব করে তুলতে শরদিন্দু যে কতটা পরিশ্রম ও পড়াশোনা করেছেন এবং অন্যদের অভিজ্ঞতাও কাজে লাগাতেন তার প্রমাণ একটি পত্র। প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত শরদিন্দুর পত্রের উত্তরে একটি পত্রে লিখছেন- "আপনার প্রশ্নের, অন্তত একটি প্রশ্নের সদুত্তর পাবেন না। দক্ষিণের তুর্কিদের মুসলমান না মনে করবার কোন কারণ নেই। কিন্তু অন্য প্রশ্নটির উত্তর অত সহজ নয়। 'নালের' আঘাতে বড় বড় পন্ডিতেরা ধরাশায়ী হয়েছেন। আমি শেষ পর্যন্ত সুনীতিবাবুর দ্বারস্থ হয়েছিলাম। নালবিহীন ঘোড়ার ব্যবহার একসময় সর্বত্র প্রচলিত ছিল। অসুবিধা এই যে ঘোড়ার পায়ে নাল আছে কিনা ভাল করে পুরানো ভাস্কর্য থেকে বোঝা যায় না। সংস্কৃত অভিধানে যে সব শব্দ আছে যেমন, 'ক্ষুরক্রম', 'বন্ধন', 'পাদুকা'-এ সবই অর্বাচীন শব্দ। আমার মনে হচ্ছে আপনি নিরঙ্কুশ। যা ইচ্ছা লিখতে পারেন। "[১১] এই পত্রের 'ঘোড়ার নাল' প্রসঙ্গে শরদিন্দু অমনিবাসের তৃতীয় খন্ডের গ্রন্থ পরিচয় অংশে লেখা হয়েছে- 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' লেখার সময় ঘোড়ার পিঠে রাত্রে পাহাড় অতিক্রমের কথা বাংলার পূর্বে শরদিন্দু জানতে চেয়েছিলেন। এদেশে ঘোড়ার পায়ে নাল পরানো হয় কখন। ঘটনাকাল সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়ার চেষ্টা , নইলে পাহাড়ে নালের আঘাতে আগুনে ফুলকি ছিটকে পড়বে, শত্রু জানতে পারবে।

শরদিন্দু তাঁর আখ্যানে সহমরণ প্রথার মতো ঘটনাকেও ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসেবে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে দেখি, কুমার কম্পনের মৃতদেহ কোলে নিয়ে তার দুই স্ত্রী কৃষ্ণা দেবী ও গিরিজা দেবী সহমৃতা হয়েছেন। লেখক বলেছেন-'বিনা দোষে দুই অভাগিনীর অকালে জীবনান্ত হইল।'

শরদিন্দু ইতিহাসের পাশাপাশি বাঙালি ঐতিহ্যকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। বাংলা ছিল ঘন জঙ্গলে ভরা, সেখানে বাঁশের প্রাচুর্য, দৈনন্দিন ব্যবহৃত এই বস্তু দিয়ে তৈরি হতো 'রণপা'। আমরা জানি, খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রাচীন গ্রিসে রাখালেরা গবাদিপশুর পাল নজরে রাখতে এটি ব্যবহার করত। এতে লাঠির ওপর দাঁড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যেত ভেড়া-বকরির পাল। নির্মাণশিল্পেও এর বহুল ব্যবহার ছিল। উঁচু উঁচু দালান তৈরির সময় নির্মাণসামগ্রী ওঠানো-নামানো, দেয়ালে আস্তরণ দেওয়া কিংবা রং করার মতো কাজগুলো করা হতো রণপা পরে। ভারতীয় উপমহাদেশে লোকনৃত্যেও ব্যবহৃত হতো রণপা। লোকগবেষকেরা একে 'যুদ্ধ নৃত্য' বা 'গোষ্ঠী নৃত্য' বলে অভিহিত করেছেন। যুদ্ধের সময় শত্রুর মোকাবিলা, ডাকাতি শেষে দ্রুত পলায়ন, এমনকি দূতিয়ালির কাজেও ব্যবহৃত হতো রণপা। উপন্যাসে দেখি অর্জুন বর্মা দুটো বাঁশের লাঠির সাহায্যে বহুদূর পথ অতি দ্রুত চলে যেতে পারতো। রাজার অশ্বারোহী গুপ্তচরকে সে এই লাঠির সাহায্যে পথ অতিক্রম করে হারিয়ে দেয়। যুদ্ধে বা যে কোন বিপদে এই বিদ্যা বিশেষ কাজে লাগে। উপন্যাসের অর্জুন এই উপায়েই শেষ পর্যন্ত বিজয়নগরকে বাঁচিয়ে দেয়। অর্জুন বর্মার এই জোড়া লাঠি 'রণপা' নামে পরিচিত। আসলে অর্জুন লাঠির দেশের লোক, যে দেশে বাঁশের লাঠিই সাধারণ লোকের প্রধান অস্ত্র সেই দেশের মানুষ সে। আসলে শরদিন্দু ইতিহাসের পাশাপাশি বাংলার এই ঐতিহ্যকে সমান গুরুত্ব সহকারে তাঁর আখ্যানে তুলে ধরেছেন।

পরিশেষে বলতে পারি যে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের ভাষা কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। একদিকে সাধু বাংলা ভাষা ও তৎসম শব্দের যথাযথ ব্যবহার পাঠককে এক সুরেলা জগতে নিয়ে যায়। ইতিহাসের পটভূমিতে ইতিহাসাশ্রয়ী কাহিনি নির্মাণের জন্য যে ভাষা তিনি অবলম্বন করেন তা বিষয়েরই

পরিপূরক হয়ে ওঠে। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটি এর ব্যতিক্রম নয়। আসলে ইতিহাসকে উপন্যাসের মোড়কে সবিস্তারে বিন্যস্ত করার নামই শুধু ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস নয়; উপন্যাসের রস ঘটনাপ্রবাহ-চরিত্র সংঘাত-দুর্বার গতিবেগ-শুভাশুভের দ্বন্দ্ব-লোকাচার ও দেশাচারের বাস্তবানুগ চিত্রায়ণ ও পরিশেষে নাটকীয়তা-এই সবেরই মণিকাঞ্চন যোগ ঘটলে সার্থক ও কালজয়ী ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসের সৃষ্টি হয়। সত্যি কথা বলতে কী, বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসের অতিপরিচিত অর্ধপরিচিত বা অল্পপরিচিত ঘটনাবলীকে অবলম্বন করে গল্প বড়গল্প বা উপন্যাস লেখার চল রয়েছে বহুকাল ধরেই, কিন্তু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত রসোত্তীর্ণ ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস, যাকে লেখক স্বয়ং Historical fiction বলে অভিহিত করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর কেউ লিখেছেন বলে মনে হয় না। এর কারণ ঐ সব ক 'টি উপাদানের সার্থক সমন্বয় বা সংমিশ্রণ। ইতিহাসের মূল ধারাটি বা ঘটনার আদি স্রোতটিকে একটুও অস্বীকার না করে-কণামাত্র বিকৃত না করে-সেই স্রোতধারার মধ্যেই লেখক চরিত্রগুলির গঠনে এমনই অসাধারণ কল্পনা, রোমান্টিকতা, নিষ্ঠুরতা ও প্রেম-দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় এনেছেন-এমন অনবদ্য নাটকীয়তা, ঘটনার গতিবেগ ও চরিত্রগুলির সার্থক সংলাপ সৃষ্টি করেছেন যে পাঠক নিজের অজান্তেই ইতিহাসের একজন সক্রিয়, চিন্তাশীল, অনুভবী দর্শকে পরিণত হয়ে যান। অতীতের স্মৃতিকথার প্রতিটি ঘটনা ও সংঘাতের সঙ্গে পাঠকের ঘটে এক total identification বা একীকরণ-আর এইখানেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের Historical fiction writer হিসেবে চূড়ান্ত ও চরম সার্থকতা। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটির ছত্রে ছত্রে এই সার্থকতার অসংখ্য নজির ছড়ানো রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায় শরদিন্দু, 'তুঙ্গভদ্রার তীরে', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৭২, পৃ. ৭
২. তদেব। পৃ.৭
৩. মজুমদার রমেশচন্দ্র, 'জীবনের স্মৃতিদীপে', জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড , ৯ডিসেম্বর ১৯৫৯, পৃ. ১৬৬
৪. বন্দ্যোপাধ্যায় শরদিন্দু, 'তুঙ্গভদ্রার তীরে', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড , প্রথম সংস্করণ ১লা অগ্রহায়ণ , ১৩৭২, পৃ. ১০
৫. তদেব। পৃ. ২২-২৩
৬. তদেব। পৃ. ১৩
৭. তদেব। পৃ. ৪৪
৮. তদেব। পৃ. ১৩২
৯. তদেব। পৃ. ৬৩-৬৫
১০. তদেব। পৃ. ৮৭
১১. গুপ্ত প্রতুলচন্দ্র, 'ইতিহাসের গল্প', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পৃ. ৫৪